

B.A (GEN) BENGALI (CBCS)

SEM- 6 DSE-1B : প্রবন্ধ ও ভ্রমণকাহিনি

Debayan Chaudhuri, Assistant Professor, Dept. of Bengali
Shahid Matangini Hazra Govt. College for Women
Chakshrikrishnapur, Kulberia, Purba Medinipur

ক. চাচা কাহিনী (নির্বাচিত)- সৈয়দ মুজতবা আলী

সারসংক্ষেপ

‘চাচা কাহিনী’-তে মোট এগারোটি রচনা আছে। ‘স্বয়ংবরা’, ‘কর্নেল’, ‘মা-জননী’, ‘তীর্থহীনা’, ‘বেলতলাতে দু-দুবার’ রচনাগুলির পটভূমি হল জার্মানি। এই গল্পগুলির কথক হলেন চাচা। ‘কাফে-দে-জেনি’, ‘বিধবা বিবাহ’, ‘রান্সসী’, ‘পাদটীকা’, ‘পুনশ্চ’ এবং ‘বেঁচে থাকো সর্দি-কাশি’ এই ছ’টি রচনার তিনটি রচনা ভারত, দু’টি রচনা ফ্রান্স ও একটি জার্মানির পটভূমিতে লেখা যদিও এই রচনাগুলির কথক চাচা নন। লেখক এখানে স্বয়ং কথক। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা আখ্যানের আলেখ্য গড়ে তুলেছে। ‘চাচা কাহিনী’র মধ্যে কথনের দিক থেকে এই ফারাকটুকু পাঠকের রসভোগে কোনও বিঘ্ন ঘটায়নি। সৈয়দ মুজতবা আলীর অনবদ্য প্রকাশে এই রচনাগুলি উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। আমরা জানি কোনও গল্পে পরপর ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনা থাকে, এ ঘটনাগুলি গল্পকে তৈরি করে কিন্তু গল্পের গল্পত্ব শুধুমাত্র এর ওপর নির্ভর করে না। আমাদের আলোচনার সুবিধার্থে আমরা রচনাগুলি সংক্ষেপে উপস্থিত করছি। মূল পাঠের সবটুকু স্বাদ পাওয়া না গেলেও এই রচনাগুলি সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা গড়ে উঠবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

স্বয়ংবরা

‘চাচা কাহিনী’র এই প্রথম রচনাতেই আমরা পেয়ে যাই বার্লিনের ‘হিন্দুস্থান হোসে’র কথা। এখানেই বসে তুমুল আড্ডা আর যার পুরোধা হলেন চাচা, সহযোগী ভূমিকায় আরো গুটি ছয় বাঙালি। জার্মানি দেশের এই আড্ডায় সাধারণভাবে অবাঙালিরা যোগ দিতেন না। এর কারণ চাচা স্বয়ং। এমনি বাংলায় কথা বললেও অবাঙালিরা থাকলে এমন তুখোড় জার্মান ভাষা বলতেন যে তারা সে কথার রস উপলব্ধি না করতে পেরে দুদিনেই ছিটকে যেত। একদিন ‘জব্বলপুরের ঔপনিবেশিক বাঙালি’ শ্রীধর মুখুয্যে বলেছিল বাঙালি বড্ড প্রাদেশিক আর পাঁচজন ভারতবাসীর

সঙ্গে মিলেমিশে ভারতীয় নেশন গড়ে তুলতে চায় না। এর মোক্ষম জবাব দিয়েছেন চাচা। তাঁর মতে বাংলাদেশ প্রদেশ নয়, দেশ। অন্য প্রদেশের নেশন বলে চিৎকার করলেও বাঙালিদের তা করতে হয় না। এর পরেই পয়লা নম্বরের আড্ডাবাজ পুলিশ সরকার বলতে চেয়েছেন অন্যান্য প্রদেশের লোক বেশি হলেও আড্ডা দিতে পারতো না কেননা আড্ডা জমাবার জায়গা হচ্ছে চণ্ডীমণ্ডপ, কাছারি-বাড়ি, বৈঠকখানা; এককথায় জমিদারী প্রথা। এই ভাবেই আড্ডার সঙ্গে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কথা টেনে আনলেন লেখক। এরপর আড্ডার সূত্রেই আমরা পরিচিত হই সূর্য রায়ের সঙ্গে, বেশিরভাগ সময় যিনি বিয়ারে ডুবে থাকতেন। এই আড্ডার সবচেয়ে চ্যাংড়া সদস্য গোলাম মৌলাকে উপস্থিতি লক্ষ করি আমরা। কথোপকথনে উঠে আসে যা সূর্য রায় কাউকে বিয়ের কথা দিয়ে ফেলেছেন। সূর্য রায় নারীজাতির থেকে নিজেকে সন্তর্পণে দূরে রাখতেন, তিনি যে বিয়ের ফাঁদে পা দেবেন এমন অসম্ভব কল্পনা কেউ কোনোদিন করতে পারেননি, কিন্তু সবাই যখন খুব খুশি হয়ে অভিনন্দন জানাচ্ছেন তখন চাচা ‘ভাবিত’ হলেন এবং এই ভাবনার হাত ধরেই আমরা পেলাম মূল গল্পের খোঁজ।

সময়টা ১৯১৯ সাল। জার্মানিতে নাৎসীবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, চাচা সবে বার্লিনে এসেছেন। বয়স আঠারো পেরোয়নি। সাইনবোর্ডে ‘গ্রেটেক্কে’ অর্থাৎ পানীয় দেখে বিয়ারখানায় ঢুকে দুধ চেয়েছেন। সবাই যখন হাসছে, হিম্মৎ সিং রাস্তা রাস্তা থেকে তাড়িখানায় এলেন। চাচার সঙ্গে কথাবার্তায় তিনি যখন বুঝতে পারলেন চাচা দুধের কথা বলতেই চারদিকে এত শোরগোল, তখন চাচাকে বসিয়ে একটু ক্ষণ পরে নিজেই এক গ্লাস দুধ নিয়ে এলেন। উভয়ের বন্ধুত্ব স্থাপন হল এই ঘটনার মধ্য দিয়ে। হিম্মৎ সিং নিজের আস্তানায় চাচাকে নিয়ে গিয়ে বাড়ির কত্রী মিসেস রুবেন্সের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন। এর পরের এক মাস বার্লিন শহরের সব হোমরা চোমরা পরিবারের সঙ্গে চাচাকে পরিচয় করিয়ে দেন হিম্মৎ সিং। হিম্মৎ সিং এর সম্বন্ধে যা জানা যায় তা হল তিনি একসময় ভারতীয় ফৌজের বড় অফিসার ছিলেন। ১৪১৪-১৯১৮ সময়সীমায় যুদ্ধ বন্দী হয়ে জার্মানদের যুদ্ধ নিয়ে পরামর্শ দিয়েছিলেন। ফলে বার্লিনের সমাজের সকলের সঙ্গেই তাঁর মেলামেশা গড়ে ওঠে। হিম্মৎ সিং একসময় নিরুদ্দেশ হয়ে যান।

তিন মাস কেটে গেছে ততদিনে, ফ্রাউ রুবেন্স একদিন টেলিফোন করে চাচাকে কাফেতে আসতে বলেন, চাচা সেখানে গিয়ে দেখেন বিপজ্জনক সুন্দরী ফ্রাউইন ভেরা গিব্রিয়াডফকে। ফ্রাউ রুবেন্স ভেরার পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে বলেছিলেন হিম্মৎ সিং এনার সঙ্গে ছমাস ছিলেন। হিম্মৎ সিং কে যেহেতু চাচা ভালোবাসেন, তাই এই দুই মহিলা অনুরোধ করলেন ভেরার ব্যাপারে। ভেরা অত্যন্ত বিপদের কারণে মস্কো থেকে বার্লিনে পালিয়ে এসেছেন, এদিকে ভেরার পাস পোর্ট

নেই। যে কোনও মুহূর্তে বার্লিন পুলিশ ভেরাকে জেলে পাঠাতে পারে, এই পরিস্থিতিতে একটাই উপায় আছে যদি চাচা ঐকে বিয়ে করেন তবে ইনি ভারতীয় অর্থাৎ ব্রিটিশ নাগরিকত্ব পেয়ে যাবেন এবং প্যারিসে যেতে পারবেন। মাস তিনেক পর অবশ্য ডিভোর্সের মোকদ্দমা আনা যাবে। হিম্মৎ সিং এর প্রতি শ্রদ্ধা দেখাবার একমাত্র পন্থা যদি হয় ফ্লাইন ভেরাকে বিয়ে করা, চাচা তবে সে কর্তব্য এড়াতে চান না, এদিকে চেনা পরিচয় নেই এমন মেয়েকে বিয়ে করাই সমস্যা— পরিস্থিতি যখন জটিল হয়ে উঠেছে, চাচার আলাপ হয় বিশ্ব বিদ্যালয়ের অর্থনীতির ছাত্রী, হকি টিমের ক্যাপ্টেন ফ্রন্ বাখেলের সঙ্গে। তিনি চাচার মুখে সমস্ত কাহিনি শুনে চাচাকে বাঁচিয়ে দেন। চাচার কথা শুনেই তিনি চলে যান ফ্রাউ রুবেন্সের কাছে। সেখান থেকে গিব্রিয়াডফের আস্তানায় গিয়ে দুজনকেই জানিয়ে দেন যে চাচার সঙ্গে ফ্রন্ বাখেলের বিয়ে স্থির। এসব কথা চাচা কিছুই জানতে পারেননি প্রথমে। পরে বাখেল সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করেন এবং চাচা এও বুঝতে পারেন যে মস্কোতে এ গিব্রিয়াডফের বাড়িতে হিম্মৎ সিং কখনও বসবাস করেননি। গিব্রিয়াডফ বর নয় একজন শ্রীখণ্ডী খুঁজছিল, যার আড়ালে সে ব্যভিচার চালাতে পারে। চাচা এইভাবেই বোকা বনে যাবার গল্প করলেন। গোলাম মৌলা শেষ ট্রেনের সময় মনে করিয়ে দিলেন। সবাই আড্ডা ভেঙে দৌড় দিলেন স্টেশনের উদ্দেশ্যে। প্রথম গল্পটি থেকেই আমরা ‘চাচা কাহিনী’র বৈঠকি মেজাজকে চিনে নিতে পারি।

কর্নেল

এই রচনার প্রথমেই আমরা পাই হিন্দুস্তান হাউসের কথা। লেখক এই রেস্টোরা খোলার প্রসঙ্গেই নিয়ে এসেছেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে অর্থনৈতিক মন্দার কথা। চাচাও আড্ডায় বলছিলেন জার্মান মুদ্রা মার্কারের মূল্য হ্রাস পাওয়ার বিষয়টি। সেই সর্বনাশের সময়ে খুব অল্প দামে জিনিস পাওয়া যাচ্ছিল। আড্ডার সবাই যখন সেই ‘সর্বনাশী পৌষ মাস’ নিয়ে ভাবছেন, চাচা তখন বিবৃত করতে লাগলেন তাঁর কাহিনি। দেশের দুর্দিনে বৈদেশিক মুদ্রার আশায়, নিজেদের সংসার চালাবার তাগিদেই বিদেশী পেয়িং গেস্ট রাখতে চাইত স্থানীয় মানুষেরা। এমন সময় ফ্লাইন ক্লারা ফন্ বাখেল তাঁর এক বন্ধুর বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণের পরামর্শ দেন। অবশ্য তাকে জানাতে হবে যে, চাচা তাঁর কাছে জার্মান ভাষা শিখতে চান তাই তাঁর বাড়িতে এসেছেন। কেননা এক কালে বড়লোক, অভিজাত এই কর্নেল কিছুতেই পেয়িং গেস্টের প্রস্তাবে রাজি হবেন না। যাহোক, চাচা কর্নেল ডুটেনহফারের বাড়ি পৌঁছুলেন, বাড়ি নয় যেন রাজপ্রাসাদ। কিন্তু সর্বাপেক্ষে অভাবে ছাপ। আসবাব নেই। দরজা জানলায় পর্দা পর্যন্ত নেই। খাবার পাতে ফ্রাউ ডুটেনহফার জানালেন কর্নেলকে যে চাচা জার্মান ভাষা বলতে পারেন, সে কথার পর কর্নেল আর কোনও দিন ইংরেজি

বলেননি। মিলিটারি কায়দায় লেখাপড়া শুরু হল। পড়ার শর্ত ছিল তিনি কোনও পারিতোষিক নেবেন না এবং পড়া তৈরি হোক বা না হোক চাচা কামাই করতে পারবেন না। এক বছর তিনি চাচাকে গ্যেটে পড়িয়েছিলেন। জার্মান দৃষ্টিবিন্দু দিয়ে ইউরোপের সভ্যতা-সংস্কৃতির ইতিহাস সুন্দরভাবে পাঠিত হল। পুরো একবছর রোজ দুঘন্টা করে চাচা এই গুণীর সাহচর্য পেলেও তাঁর জীবন বা পরিবার নিয়ে একটি কথাও শুনতে পারেননি। তবে চাচা বুঝতে পেরেছিলেন কর্নেল প্রাশান কৌলিন্য নিয়ে গর্বিত। এবং রক্তসংমিশ্রণ ঠেকাতে তিনি প্রাণবিসর্জন দিতেও রাজি! একদিন কথায় কথায় কর্নেলের স্ত্রীর থেকে চাচা জানতে পারেন যে তাঁদের ছেলে ফ্রান্সের লড়াইয়ে মারা গেছে।

কর্নেলকে দেখে বোঝা যেত না পুত্রশোক। চাচা একদিন কলেজ থেকে ফিরছেন, দেখলেন এক যুবতী অঝোরে কাঁদছেন। কর্নেল শিশুসন্তান কোলে তাঁর কন্যাকে তাড়িয়ে দেওয়ার পর তাকে বাড়িতে পৌঁছে দিলেন চাচা। এদিকে ঘরে এসে দেখেন যে ঘর ছাড়ার নির্দেশ। চাচা পরদিন সকালবেলায় ডুটেনফারদের বাড়ি ছাড়লেন। আড্ডার সবার কৌতুহল যে মেয়েটির কী দোষ ছিল। চাচা তারপর বললেন যে একবছর পর তিনি কর্নেলের শেষকৃত্যে অংশ নিতে গিয়ে শোনে যে, কর্নেলের মেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপককে বিয়ে করেছিলেন, যিনি জাতিতে ফরাসী। আমরা বুঝতে পারলাম যে জার্মান জাতির বিশুদ্ধতার প্রশ্নে কর্নেল নিজের মেয়েকে ছাড় দেননি। জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিতে নাৎসিদের মতই তিনিও বর্ণ সঙ্করের বিপক্ষে ছিলেন। আর এর জন্য নিজের প্রাণও প্রকারান্তরে বিসর্জন দিলেন। এই গল্পটির মাধ্যমে লেখক জাতীয়তাবাদী ইতিহাসের এক রকমের সমালোচনা তৈরি করলেন কর্নেল চরিত্রের পরিণতি দেখিয়ে।

মা- জননী

‘চাচা কাহিনী’- এর বাকি দুটি রচনার মতো এ গল্পও আমরা পাই ‘হিন্দুস্তান হৌসে’র আড্ডা থেকেই। জমাটি আড্ডায় লাজুক গোলাম মৌলা তাঁর ল্যান্ডলেডি ও তাঁর মেয়ের ঝগড়ার প্রসঙ্গ উত্থাপন করতেই আড্ডার সবাই বিষয় পেয়ে যায়। একদল বলেন বাচ্চার জন্য ভালোবাসা অনুন্নত সমাজেই পাওয়া যায় বেশি আবার অন্যেরা বলেন, ভারতের একান্নবর্তী পরিবার সভ্যতার পরাকাষ্ঠী আর তা অবলম্বন করে আছে মা- জননীকে। চাচা বলতে থাকেন জার্মানির বেশিরভাগ ল্যান্ড লেডিই বিধবা। কুরুক্ষেত্রের শত বিধবার রোদনের কথা নিয়ে আসেন চাচা। এরপর তিনি বাৎসল্য রসের একটি গল্প আড্ডায় পরিবেশন করেন।

আমরা ‘কর্নেল’ গল্পে চাচার বাড়ি ছাড়ার কথা জেনেছিলাম। যাহোক এরপর চাচা কোথায় থাকবেন এ নিয়ে কিছু ভেবে উঠতে পারছিলেন না, এমন সময় আবার মুশকিল আসান হয়ে আসেন ফন্ ব্রাখেল। ক্লারা বললেন পয়সা কামাতে হলে তিনি বন্দোবস্ত করে দিতে পারবেন। এক ‘হঠাৎ-নবাবে’র ছেলের যক্ষা হয়েছে। একজন সঙ্গীর দরকার। থাকা খাওয়ার সঙ্গে ভালো মাইনে দেবে। টেলিফোনে যোগাযোগ করে চাচা পৌঁছে গেলেন রাইনল্যান্ডে। কর্তা গিল্লির সঙ্গে প্রাথমিক আলোচনার পর চাচা রোগাক্রান্ত কার্ল-এর ঘরে গেলেন। ঘরে আরেকটি প্রাণী উপস্থিত ছিলেন তিনি হলেন রোগীর নার্স। মেয়েটির নাম সিবিলা। সে সমস্ত প্রাণ দিয়ে কার্লকে আগলে রাখছে। মাঝেমাঝে সিবিলা উদাসীন হয়ে যান, চাচা লক্ষ্য করেছেন। হঠাৎ একদিন বাড়ির গিল্লি চাচাকে জানালেন যে সিবিলা অন্তঃসত্ত্বা ও অবিবাহিতা। গিল্লির অনুরোধে চাচা সিবিলার সঙ্গে কথা বলতে রাজি হলেন। সিবিলা টেবিলের ওপর মাথা রেখে অঝোরে কাঁদছিল। কর্তা গিল্লিও আন্তরিকভাবে সিবিলার বিপদ সম্বন্ধে ভাবছিলেন। স্থির হল যে সিবিলা কাজ করতে থাকুক, প্রসবের সময়ে নার্সিং হোমে ভর্তি করা হবে। এরপর সিবিলার বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হল। যেন একমুঠো জুঁইফুল! কিন্তু এবার আরেক বিপদ ঘটল। সিবিলা কিছুতেই তার বাচ্চাকে অনাথ আশ্রমে দিতে রাজি নয়। তার ইচ্ছে কোনও পরিবারে থেকেই তাঁর সন্তান বড় হয়ে উঠুক। অনেক চেষ্টা করে এমন এক দম্পতিকে পাওয়া গেল কিন্তু তাঁরা শর্ত দিলেন সিবিলা কিংবা অন্য কেউ জানার চেষ্টা করবে না কারা সিবিলার বাচ্চাকে গ্রহণ করলেন। সিবিলা রাজি হল। তার দুদিন সময় লেগেছিল। সিবিলাকে নিয়ে চাচা চলেছেন স্টেশনের পথে। পথ যত এগোচ্ছে, সিবিলা ততই অস্থির। গাড়ি থামিয়ে শিশুর জন্য সিবিলা খেলনা, জামাকাপড় কিনতে থাকে। তার জমানো অর্থ শেষ হয়ে গেলে চাচার কাছ থেকে পাঁচ মার্ক নিয়ে এক মাসের শিশুর জন্য বই কেনে। এই সব করে যখন স্টেশনে পৌঁছয়, গাড়ি আসতে আর মাত্র কয়েক মিনিট বাকি।

গাড়ি চলে এসেছে। পোর্টার সিবিলার সুটকেস তুলে দিয়েছে। চাচার হাটু জড়িয়ে সিবিলা বলছে চাচা কথা দিন যে তার সন্তানের খবর নেবেন। চাচা নিরুপায় হয়ে কথা দিলেন যদিও তিনি জানতেন না যে এরপর আদৌ খবর পাওয়া যাবে কিনা। সিবিলা গাড়িতে গিয়ে বসে। এমন সময় চাচা আর সিবিলার কামরার মাঝখান দিয়ে এক মহিলা ধীরে সুস্থে ছোট্ট একটি ছেলের হাত ধরে চলে গেল। সিবিলা তাদের লক্ষ্য করেছিল কিনা জানা যায় না, দরজা খুলে প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়ল আর চাচার কাছ থেকে বাচ্চা কেড়ে নিতে গাড়িতে উঠলো। শেষে চাচা বলছেন – “আমি বাধা দিলুম না।” পাঠকের হৃদয় মথিত করা টানটান বাৎসল্য রসের গল্প এটি। মায়ের মনের সূত্রে এই গল্পের নামকরণ সার্থক।

তীর্থহীনা

‘হিন্দুস্তান হৌসে’র আড্ডা সেদিন ভালো করে জমছিল না। কোথেকে এক পাদ্রীসাহেব এসে হাজির। পাদ্রীর সঙ্গে আড্ডার সদস্যদের তর্ক-বিতর্ক চলছে। ওয়েস্ট্রেস বড় টেবিলে খাবার সাজিয়ে ফেলেছে। চাচা পাদ্রীকে আহ্বান করতেই তিনি কেটে পড়লেন। এরপর ধর্ম, মিশনারি প্রভৃতি প্রসঙ্গ এল। তারপর চাচা ক্যাথলিক ধর্মের সঙ্গে তাঁর অল্পবিস্তর পরিচয়ের কথা ব্যক্ত করতে লাগলেন। ‘আভে- মারিয়া’ হল মা- মেরির উপাসনা মন্ত্র। যে প্রার্থনায় সাড়া দেয় সর্ব নাস্তিক, সর্ব আস্তিক। একদিন চাচা এই সংগীতে বিভোর, এমন সময় শুনতে পেলেন একটি মেয়ের ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না। চাচা মেয়েটিকে চিনতে পারলেন। কার্ল- কে এক্স রে করাতে গিয়ে এই মেয়েটির মায়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। এই মেয়েটির ও যক্ষ্মা হয়েছে। এরপর একমাস কেটে গিয়েছে। চাচার সঙ্গে উইলির দেখা হয়েছে। যুডাস টাডেয়াস তীর্থের কথা উল্লেখিত হল। রাইন নদীর ওপারে হাইস্টারবাখার রোট। সেখান থেকে আধ মাইল দূরে টাডেয়াস তীর্থ। নাস্তিক উইলি বারবার বুঝিয়ে দিয়েছে তীর্থ না করে কেউ ক্যাথলিক ধর্মে প্রবেশ করতে পারেনি। আর ক্যাথলিক ধর্ম যে কতটা কুসংস্কারাচ্ছন্নতা এই তীর্থে না গেলে বোঝা যাবে না। যাহোক, পাদ্রীসাহেবের নেতৃত্বে জনা তিরেশেক দল বেধে রওনা দিলেন তীর্থের উদ্দেশ্যে। চাচা যখন তীর্থ যাত্রার প্রারম্ভিক পর্বে পালাই পালাই করছেন পাদ্রী সাহেবের তৎপরতায় আলাপ হল সেই যক্ষ্মারোগিণী আর তার মায়ের সঙ্গে। উইলির মাসির থেকে গ্রেটের কান্নার কারণ জানা গেল। এই মেয়ে বাল্যবিধবার থেকেও হতভাগিনী, এর বল্লভ হঠাৎ একদিন উধাও হয়ে যায়। পয়সার লোভে অন্যত্র বিয়ে করার জন্য সে গ্রেটকে ত্যাগ করে। দুবছর গ্রেট কাউকে কিছু বুঝতে দেয়নি। হাসিখুশি মেয়েটির এরপর যক্ষ্মা হয়। দুরারোগ্য ব্যাধি যখন তাকে কাবু করে ফেলছে, পাদ্রী এবং মায়ের ইচ্ছেয় সে রাজি হয় তীর্থে যেতে। গ্রেটের মায়ের শেষ আশা ছিল যে টাডেয়াসের দয়ায় যদি মেয়ের বর জোটে। পথের মাঝেই প্রকৃতি বাদ সাধে। তুমুল বৃষ্টি আর ঝড়। রাস্তার পাশের শরাইখানায় আশ্রয় নেওয়া গ্রেট ও সঙ্গীরা ঝড়ের মধ্যেই শুনতে পেল বারোটা বাজার ঘন্টা অর্থাৎ পরব শেষ হল। জীবনের শেষ আশাটুকু ফুরিয়ে গেল গ্রেটের।

মাস দুই পরে চাচা গির্জায় গিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না শুনলেন। দেখলেন গ্রেটের মা। পরনে কালো পোশাক। এই রচনায় অসুস্থ গ্রেটের তীর্থে না পৌঁছতে পারা এবং তার মৃত্যু এই গল্পটিকে করুণ পরিণতি দান করেছে।

বেলতলাতে দু'- দুবার

এই রচনার শুরুতেই পাই নাৎসিদের প্রতাপ দিন দিন বেড়ে যাওয়ার কথা। হিন্দুস্তান হৌসের আড্ডার সদস্যদের তাতে কোনও আপত্তি করার কথা নয়। নাৎসিরা যদি ইংরেজদের বিপদে ফেলতে পারত, তবে আড্ডার সদস্যরা খুশি হত। কিন্তু বেদনার বিষয় এই যে দু-একজন মূর্খ নাৎসি জাতিবিদ্বেষের ভুল বশবর্তী হয়ে আক্রমণ করত ভারতীয়দের। আড্ডার নবীন সদস্য গোলাম মৌলা নাৎসিদের সম্বন্ধে অসহিষ্ণু। পুলিন সরকার, সূর্য্য রায় নিজেদের মত পোষণ করছিলেন। ইংরেজ ও নাৎসিদের পরাধীন ভারতবাসীর প্রতি ব্যবহার চিনিয়ে দেয় ইংরেজরা অনেক বেশি চালাক। আড্ডার ধর্মেই রঙ্গ-রসিকতার মধ্য দিয়ে আড্ডা উঠছিল।

চাচা গলাবন্ধ কোটের ভেতর হাত ঢুকিয়ে দিয়ে চোখ বন্ধ করে বসেছিলেন। ভক্ত গোসাঁই জিজ্ঞেস করলেন কেন চাচা কিছু বলছেন না। চাচা বললেন- “ আমি ওসবেতে নেই। আমার শিক্ষা হয়ে গিয়েছে। ” আর এর সূত্র ধরেই আমরা পাচ্ছি চাচার অভিজ্ঞতালব্ধ কাহিনি, ঘটনাস্থল মিউনিক। চাচার কথা থেকে জানতে পারি তিনি আর সূর্য্য রায় মিউনিক থেকে পনেরো মাইল দূরে ছোট্ট একটি গ্রামে পাশাপাশি বাড়িতে থাকতেন। চাচা থাকতেন এক মুদির সংসারে। এই সংসারে প্রত্যেকের রসবোধ ছিল প্রবল এবং সকলেই ওস্তাদি সংগীতে আসক্ত। মুদির বড় ছেলে অক্ষর বেহলা বাজাতো। অক্ষর প্রচুর পরিমাণে মদ খেত। সে ছিল পাঁড় নাৎসি। ভারতীয় হিসেবে চাচা মদ খায় না বলে প্রশংসা করতো অথচ অন্ধ নাৎসিভক্তিতে অমানবিক কথা বার্তা বলতো। তার মতে ইহুদীরা যতদিন এদেশে থাকবে ততদিন বর্ণ সঙ্করের সম্ভাবনা। জার্মানীর নর্ডিক জাতির পবিত্রতা রক্ষা করতেই হবে। চাচা তাকে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, ভারতবর্ষেও আৰ্য জাতি রয়েছে এবং তারা জার্মানদের চেয়েও ঢের বেশি প্রাচীন এবং কুলীন। ভারতবর্ষ তার প্রাচীন যে সংস্কৃতি নিয়ে গর্ব করে, তা আৰ্য ও অনার্য সভ্যতার অর্থাৎ বর্ণসঙ্করের ফলে। এরপর আলোচনা ভেসে যায়। চাচার সঙ্গে অক্ষরের সম্পর্কে অবনতি হয়। এর পর বছর খানেক কেটে গিয়েছে। রয়ানডর্ফের বাৎসরিক মেলা উপস্থিত। বুড়োবুড়ি ও মারিয়া চাচাকে নেমন্তন্ন করে গেলেন মেলা দেখতে যাবার। এখানে এটাই রেওয়াজ।

মেলায় রাত্রি হলে শরাবখানায় চাচা আর মারিয়াকে রেখে বুড়োবুড়ি বাড়ি চলে গেলেন। তাদের জায়গায় এসে বসলো এক কপোত- কপোতি। মেয়েটি চাচার প্রতি অনুরক্ত হতে শুরু করেছে। মারিয়ার কাঁধে তখন শ্যাম্পেনের ভূত নাচছে। ওদিকে কপোত বাজপাখির মূর্তি ধরতে আরম্ভ করেছে। মেয়েটির হাত থেকে রক্ষা পেতে চাচা শরাবখানার মুখোমুখি ছোট বিয়ার ঘরে পালালেন যেখান থেকে মারিয়ার দিকে লক্ষ্য রাখা যায়। এটাই হল আরেক ভুল। কপোতি সেখানে

তুকেই বললো- ‘ একটু দেরি হলো। কিছু মনে করোনি তো?’ চাচার কাছ থেকে টেলিফোন নম্বর টুকে নিল। এমন সময় তার প্রেমিক এসে হাজির। অবস্থা চরমে। চাচা যতই বলছেন ফ্লাইনের প্রতি তার বিন্দুমাত্র অনুরাগ নেই, কিন্তু শোনে কে? এর মধ্যে ছেলেটি বর্ণসঙ্কর নিয়ে বক্তৃতা শুরু করে দিয়েছে। এর মধ্যে কোথেকে হাজির হল অস্কার। সে চাচার কাছে জানতে চায়- ‘ কী হয়েছে? আবার নাৎসিদের গালাগাল দিয়েছিস বুঝি?’ বেহেড মাতাল অবস্থাতেই অস্কার যা বোঝার বুঝল এবং ঐ কপোতিকে জড়িয়ে ধরলো। তার প্রেমিককে আহ্বান করল রোগা চাচাকে ছেড়ে তার সঙ্গে লড়তে। চাচা পুলিশকে ডেকে আনলেন। কপোত কপোতি বিদায় নিল। এরপর অস্কারের বান্ধবী জিঞ্জেরস করেছে যেই চাচা কোন দেশের লোক, চাচা দিলেন চম্পট কেননা পয়লা কপোতিও এই প্রশ্ন দিয়েই আরম্ভ করেছিল। অস্কার চোঁচিয়ে জিঞ্জেরস করছিল- ‘যাচ্ছিস কোথায়?’ চাচা বললেন- ‘ আর না বাবা! এক রাত্তিরে দু-দুবার না। ’

কাফে-দে-জেনি

প্যারিসের প্রেক্ষাপটে এই রম্যরচনাটি লেখা হয়েছে। আকারে অন্যান্য রচনার চেয়ে ক্ষীণ কলেবর হলেও প্রসাদগুণে পাঠকপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এই গল্পের কথক চাচা নন, ইরশাদ চৌধুরী। কথকের স্বরে অবশ্য কোনও পার্থক্য ঘটেনি। যাহোক, কথক রাত বারোটায় প্যারিসে থিয়েটার থেকে বেরিয়ে ভাবছেন কোথায় যাবেন। তারপর কাফেতে গেলেন। মাঝারি ভিরের কাফেতে কথক স্বস্তি অনুভব করলেন। দেখলেন একটি টেবিলে জায়গা ফাঁকা আছে। শুধু একজন খবরের কাগজের ফেরিওয়ালা, কালো টুপিতে সোনালি হরফে ‘ল্য মাতা’ লেখা, চোখ বন্ধ করে দম নিচ্ছেন। কথক তাকে বললেন মোলায়েম সুরে-“ মসিয়ো যদি অনুমতি করেন-” খুব সাধারণভাবেই বোঝা যায় কথক বসবার অনুমতি প্রার্থনা করছেন। কিন্তু ল্য মাতা অদ্ভুত কথাবার্তা বললেন। এবং চলেও গেলেন। প্রাথমিকভাবে অবাক কথক কাফেতে বসে ওয়েটারকে ডাকলেন খবর কাগজ দেবার জন্য। তখন ওয়েটার বলার চেষ্টা করলেন এই ‘কাফে দে জেনি’- তে সবাই এত জিনিয়াস যে কেউ খবরের কাগজ পড়েন না। ওয়েটার গ্রীক ভাষার একটি সাপ্তাহিক দিতে চেয়েছিলেন, কথক তাকে নিরস্ত করলেন।

এরপর সেই টেবিলে এসে বসলেন এক ভদ্রলোক। নাম পল রনাঁ। কথকের সঙ্গে ধীরে ধীরে তাঁর ভাব জমে উঠল। এবং জানা গেল আগে এই টেবিলে যিনি বসেছিলেন তাঁর নাম ফের্না রুমোর। তিনি লেখালেখি করেন। এই সূত্রেই লেখক জানতে পারেন যে পল রনাঁ ছবি আঁকেন। ছবি আঁকার জন্য নিজেকে সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃতিতে লোপ করে দিতে বলে তিনি লেখা পড়া ভুলে

গিয়েছেন। ভাষা ভুলতে দশ বছর সময় লেগেছে। তিনি রাস্তার নাম ও পড়তে পারেন না, সই করতেও অক্ষম। জীবনের প্রথম প্রভাতে মানুষ কী দেখেছিল চোখ মেলে, যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত সভ্যতার বর্বর কালিমামুক্ত জ্যোতির্দৃষ্টি দিয়ে তিনি তাই তাঁর ছবিতে ফুটিয়ে তুলতে চান। কথক স্বাভাবিকভাবে ছবি দেখার জন্য আকৃষ্ট হলেন। সেখানে গিয়ে ছাত থেকে মেঝে পর্যন্ত দেখলেন অদ্ভুত সব ছবি। সামঞ্জস্যহীন, তালগোল পাকানো। বলা বাহুল্য কথকের মনকে তৃপ্তি দিতে পারে নি এই সমস্ত ছবি।

পল রনাঁ কথকের সঙ্গে আলাপ করিয়েছিলেন তাঁর মডেল, ফিয়াসেঁ, বন্ধু নানেৎ- এর সঙ্গে। কথক ছবি দেখার সময় শুনতে পেলেন রনাঁ নানেৎ কে বলছেন- “...আমার আসন চিরকাল তোমার পায়ের কাছে।” কথক নিঃশব্দে যখন বাইরে এলেন, সকালের সূর্য উঠে গেছে। স্বপ্ন কেটে গেল। ‘ নিশার প্যারিসে কভু, হাবা ওরে, বলি তোরে, কাফে ছেড়ে বাহিরিতে নাই’- কথার মধ্য দিয়ে এই রচনা শেষ হলেও পাঠক পেয়ে যায় বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও নানা রকম মানুষের আশ্বাদ।

বিধবা-বিবাহ

আমাদের পুজো সংখ্যা ত্রিসমাস স্পেশালের অনুকরণে জন্ম নিয়েছিল কিনা এই ভাবনার সূত্রে এই কাহিনির শুরু। বরোদার ভূতপূর্ব মহারাজা তৃতীয় সয়াজী রাও- এর বলা হয়েছে। ইনি ছিলেন আসলে রাখাল ছেলে, বরোদার শেষ মহারাজা ইংরেজদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার অপরাধে গদ্যচ্যুত হলে তাঁর আত্মীয় বলে ঐঁকে মহারাষ্ট্রের মাঠ থেকে ধরে এনে গদিতে বসানো হয়। তখন তাঁর বয়স ষোলো। এরপর তিনি বাষট্টি বছর রাজত্ব করেন। নিজের রাজ্যে আইন করে বাল্যবিবাহ বন্ধ করেন, গ্রামে গ্রামে লাইব্রেরী খোলার ব্যবস্থা করেন এবং আরও জনহিতকর কাজ করে রাজ্যের জন্য ত্রিশ কোটি তাকা রেখে যান। ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। বরোদার বিখ্যাত ওরিয়েন্টাল ইন্সটিটিউট এর অধ্যক্ষ ছিলেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ছেলে শ্রীযুক্ত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য। সয়াজী রাও-এর অনুরোধেই নন্দলাল বসু বরোদার কীর্তিমন্দিরের চারটি বিরাট ছবি ঐঁকেছিলেন। সয়াজী রাও-এর সম্বন্ধে প্রাথমিক পরিচয় দিয়ে পূব বাংলার এক মৌলবী সাহেবের কাছে শোনা এক গল্প লেখক নিবেদন করেছেন।

খাস বাঙাল ভাষায় আরবী- ফারসী শব্দ মিশিয়ে মৌলবী নসিয়তে ভ্যাকুয়াম ক্লিনারের মতো টান দিয়ে জানালেন সয়াজী রাও কেন যে চিড়িয়াখানা বানালেন তা বলা মুশকিল। বহু দেশ থেকে ঘুরে ঘুরে জানোয়ার নিয়ে এসেছেন চিড়িয়াখানায়। একবার বিলেত যাবার সময় তাঁর পরিচয় ঘটে হাবশী দেশের রাজা হাইলে সেলাসিসের সঙ্গে। তিনি সয়াজী রাও-কে খুব খাতির করলেন। জাহাজে সয়াজী রাও হাবশী রাজাকে কাশ্মীরি শাল উপহার দিলেন। প্রত্যুত্তরে অনেক ভাবনা চিন্তার পর হাবশী রাজা এক জোড়া সিংহ- সিংহী পাঠালেন তোফা হিসেবে। তাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা হল। অনেক দূর থেকে লোকেরা এসে ভিড় করল। এরপর হঠাৎ করেই একদিন সিংহ মারা যায়। সিংহী কিছু বুঝতে না পেরে সিংহের চারপাশে চক্কর কাটাচ্ছে। সিংহের মৃতদেহ বের করতে ম্যানেজারের দফারফা। এদিকে সারা বরোদাতে শোকের ছায়া নেমেছে। সিংহের বিহনে সিংহী খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। দুর্বল শরীর নিয়ে খাঁচা ভাঙার চেষ্টা চালাচ্ছে। এরপর সয়াজী রাও হাবশী সিংহ যোগাড় করবার জন্য আদেশ দিলেন। কিন্তু সাবধান থাকতে হবে হাবশীরাজ যেন খবর না পান তাঁর দেওয়া উপহারের সিংহ মারা গেছে।

এক মাস পর কাঠিয়াওয়াড় থেকে ‘বর’ এল। দেশি সিংহ। খাঁচার দরজা দিয়ে যখন সে ঢুকছে হঠাৎ সিংহী এক হনুমানের মত লাফ দিয়ে পড়ল সিংহের ঘাড়ে। সঙ্গে তিন কিংবা চার খানা বিরশি শিকার খাবড়া। কাঠিয়াওয়াড়ী দামাদ একেবারে ঠাণ্ডা। বোঝাই যাচ্ছে সিংহী একে মেনে নিতে পারেনি। এরপর মৌলবী সাহেব যখন চলে যাচ্ছেন, কী মনে করে থামলেন এবং জানালেন যে; সয়াজী রাও- কে বহু সাহস করে যখন দেশী সিংহের পরিণতি বলা হল, তিনি কোনওরকম চোটপাট করলেন না। মুচকি হেসে বললেন- “ আমি যখন বিধবা- বিবাহের জন্য একটা নয়া আন্দোলন আরম্ভ করতে চেয়েছিলুম, তখন তোমরাই না গর্ব করে বলেছিলে, এদেশের খানদানী বিধবা—তা সে হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক—নতুন বিয়ে করতে চায় না? হাবশী সিংগিনী এদেরও হার মানাল যে! ”

রাফসী

এই কাহিনি গড়ে উঠেছে লেখকের বরোদা বাসকালীন সময়ে অভিজ্ঞতার সূত্র ধরে। বরোদার মহারাজা সয়াজী রাও গাড়কোয়াড়-এর দ্বারা আমন্ত্রিত হয়ে সৈয়দ মুজতবা আলি বরোদায় অধ্যাপনা করতে যান এবং ১৯৩৫- ১৯৪৪ অব্দি সেখানে থাকেন। ‘চাচা কাহিনী’ গ্রন্থের এই

রচনাটি রস আবেদনের দিক থেকে একদম আলাদা। এটি মূলত বীভৎস রসের গল্প। পার্সী সম্প্রদায়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া রয়েছে গল্পের কেন্দ্রে।

পার্সীদের মৃত্যুর পর পোড়ানো হয় না, সমাধিস্থ করা হয় না, মৃতদেহকে রেখে দিয়ে আসা হয় টাওয়ার অফ সাইলেন্স বা মৌন শিখরে। দেওয়ালের ভিতরের দিকে বড় শেলফের কুলুঙ্গি থাকে। সেগুলোর মৃতদেহকে বিবস্ত্র করে শুইয়ে দেওয়া হয়। শকুন ওত পেতে থাকে। তারপর যা হয় বলাই বাহুল্য। এই প্রথাটি বীভৎস। রৌশন গল্পকারকে বলেন- “ বোম্বায়ে টাওয়ার অফ সাইলেন্সের আশপাশের কোনো বাড়িতে কখনো বাসা বাঁধলে জানতেন। একটা শকুনি হয়তো একটা মরা বাচ্চার মাথাটা নিয়ে উড়ে যাচ্ছে আপনার বাড়ির উপর দিয়ে, আরেক শকুনির সঙ্গে লাগলো তখন তার লড়াই। ছিটকে পড়ল মুড়ুটা আপনার পায়ের কাছে, কিংবা মাথার উপরে। ” গল্পের মূল বীভৎসতার কাহিনিতে পরে আসছে।

রৌশনের কথার থেকে জানা যায় গ্রীষ্মকালে এক অস্থিচর্মসার আশি বছরের বুড়িকে অনেক কষ্টে শববাহক জুটিয়ে নিয়ে যায়। এর তিন মাস পরে আবার কথকের টাওয়ার অফ সাইলেন্সে যেতে হয় তার বিধবা পিসির জন্যে। শববাহকেরা ক্লান্ত হয়ে মড়া নিয়ে ঢুকেছে, এমন সময় চিৎকার। তারা পাগলের মত ছুটে গেট দিয়ে বেরিয়ে এসে দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য। টালমাটাল। এরপর কর্তব্যবোধে দস্তুরজী এবং কথক গিয়ে দেখেন সেই হাড়িসার বুড়িকে। শেলফের ভেতর পা ছড়িয়ে বসে আছে। চোখের কোটর দুটো ফাঁকা। কালো দুই গর্ত। কথক অজ্ঞান হয়ে যান। জ্ঞান ফেরে বৃষ্টিতে। চারপাশে স্কুলের ছেলেরা, শববাহকদের পাগলের মত ছুটে যাওয়া দেখে কথকদের খোঁজে এসেছিল। পরে বোঝা গেল তিন মাসে বুড়ির মৃতদেহ গরমে এমনভাবে বেঁকে গিয়েছিল যেন পা দুটো ছড়িয়ে বসে আছে। চোখ উবে গিয়েছে। কিন্তু সারা শরীর অক্ষত কেননা শকুনেরা আর নেই। এই ঘটনার বীভৎসতা এমন ছিল যে বাকি দুজন শববাহক ভেতরে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল তাদের আর জ্ঞান ফেরেনি, বাইরে যারা এসেছিল তাদের মাথায় ধরেছে, একজন পাগলা গারদে। দস্তুরজী এই ঘটনা সামলে উঠলেও অকালে বৃষ্টি নামলে কথকের মনে এই ছবি আসে ও তা ভুলতে নেশার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। গা শিরশিরে এই কাহিনি পাঠককে বিহ্বল করে তোলে। আমরা অবগত আছি জুগুন্সা বীভৎস রসের স্থায়ীভাব। ব্যাধি, মরণ, উদ্বেগ, ভয় প্রভৃতি ব্যভিচারী ভাব এই গল্পে সুন্দর ধরা পড়েছে। টাওয়ার অফ সাইলেন্স, বুড়ির বিকৃত শব এই গল্পটিকে এরকম রসপরিণতি দান করেছে।

পাদটীকা

কোনো জাতিকে শাসন করতে হলে শুধু গায়ের জোর ফলালেই চলে না, শাসিত জনগণের মন এবং মাথায় পরাধীনতার বোধ প্রবেশ করিয়ে দিতে হয়। তারা যাতে মেনে নিতে বাধ্য হয়, এই শৃঙ্খল তাদের অনিবার্য নিয়তি। ইংরেজ তাদের শাসনের সুবিধার জন্য যেমন ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সৃষ্টি করেছিল, তেমনি সেইসঙ্গে দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার মরণ ঘনিয়ে তুলেছিল। এই গল্পের ‘পন্ডিতমশাই’ চরিত্রটির মধ্য দিয়ে লেখক ঔপনিবেশিক সময়ে ইংরেজি শিক্ষার জয়জয়কারে দেশীয় শিক্ষার ধারক –বাহক কাব্যতীর্থ- বেদান্তবাগীশদের মর্মান্তিক অবস্থার কথাই ফুটিয়ে তুলেছেন।

লেখক বাল্যকালের স্মৃতি থেকে তুলে এনেছেন নামচরিত্রকে। গল্পের প্রথমে তাঁর স্বভাব বর্ণনা করছেন- “ কিন্তু পন্ডিতমশাই যত না পড়াতে, তার চেয়ে বকতেন ঢের বেশি, এবং টেবিলের উপর পা দুখানা তুলে দিয়ে ঘুমুতেন সব চেয়ে বেশি। ” পন্ডিতমশাই হেডমাস্টারকে একদম পরোয়া করতেন না যেহেতু হেডমাস্টারমশাই ছেলেবেলায় তাঁর কাছে সংস্কৃত পড়তেন। পন্ডিতমশাই-এর রং ছিল শ্যাম, মাসে মাত্র একদিন তিনি দাঁড়ি- গোঁফ কামাতেন, পরতেন হাঁটু-জোকা ধুতি। দেহের উত্তমার্ধে একটি দড়ি প্যাঁচানো থাকত- অঞ্জেরা বলত এটি দড়ি নয়, চাদর। গল্পের প্রথমে পন্ডিতমশাই –এর বর্ণনার মধ্য দিয়ে হাস্যরসের উদ্বেক হতে থাকে, কিন্তু পাঠক অপ্রস্তুত হয়ে যায় গল্পের পরবর্তী অংশে।

লাটসাহেবের স্কুল পরিদর্শন ছিল সে সময়ের বড়ো ঘটনা। সাহেবের মর্জির ওপরেই যেহেতু স্কুলের অনুদান নির্ভর করতো, তাঁকে খুশি করার মরিয়া প্রয়াস নিত্য নতুন ঘটনার জন্ম দিত। শাস্ত্রে সেলাই করা কাপড় পরা নিষেধ বলে পন্ডিতমশাই পাঞ্জাবি- শার্ট না পরলেও লাটসাহেবের আগমন উপলক্ষ্যে লম্বা হাতা আনকোরা হলুদ গেঞ্জি পরে এসেছেন, এ নিয়ে সকলে মস্করা করছে। এদিকে পন্ডিতমশাই-এর সারা শরীর চুলকোচ্ছে। কথকের বুদ্ধিতে খানিক সময়ের জন্য এটি ছেড়ে রাখলেও লাটসাহেবের পরিদর্শনের সময় তিনি গেঞ্জি পরে যন্ত্রণা সহ্য করেছিলেন। যাহোক, লাটসাহেবের সাথে সাক্ষাৎপর্ব মিটেছে। তিন দিন ছুটির পর আবার ক্লাস বসেছে। পন্ডিতমশাই আগের মতই টেবিলে পা তুলে ঘুমুচ্ছেন না চোখ বুজে আছেন, বোঝা যাচ্ছে না। হঠাৎ কথককে জিজ্ঞেস করলেন- ‘ লাটসাহেবের সঙ্গে কে কে এসেছিল বল তো রে। ’ কথক সবার কথা বললেও কুকুরের কথা বলেনি। পন্ডিতমশাই এই রকমের পর্যবেক্ষণ শক্তি নিয়ে খোঁচা দিলেন। অনেকক্ষণ চোখ বুজে বলতে লাগলেন যে, শুক্রবার দেহিতে ঘাটে গিয়ে দেখেন নৌকার মাঝি এক অপরিচিতের সঙ্গে আলাপ করছে, লোকটা লাটসাহেবের আরদালি।

সাহেবের সঙ্গে এসেছে, দিদিকে দেখতে যাবে বলে সেই দিন ছুটি নিয়েছে। তার থেকেই জানা গেল কীভাবে লাটসাহেবের কুকুরের ঠ্যাং ট্রেনে কাটা গেল। আরো একটি তথ্য জানা গিয়েছিল সেটি হল, সাহেবের কুকুরের পেছনে মাসে পঁচাত্তর টাকা খরচ হয়। পন্ডিতমশাই ক্লাসে জিজ্ঞেস করলেন- ‘ বলতো দেখি, যদি একটা কুকুরের পেছনে মাসে পঁচাত্তর টাকা খরচ হয়, আর সে কুকুরের তিনটে ঠ্যাং হয়, তবে ফি ঠ্যাঙের জন্য কত খরচ হয়?’ কথকের উত্তর - ‘পঁচিশ টাকা’। এরপর পন্ডিতমশাই বলে চললেন- ‘ উত্তম প্রস্তাব। অপিচ আমি, ব্রাহ্মণী, বৃদ্ধা মাতা, তিন কন্যা, বিধবা পিসী, দাসী একুনে আটজন, আমাদের সকলের জীবনধারণের জন্য আমি মাসে পাই পঁচিশ টাকা। এখন বল তো দেখি, তবে বুঝি তোর পেটে কত বিদ্যে, এই ব্রাহ্মণ পরিবার লাটসাহেবের কুকুরের কটা ঠ্যাঙের সমান?’ এর উত্তর কেউ দিতে পারেনি। পারার কথাও নয়। ক্লাসের প্রত্যেকটি ছেলেই বুঝতে পারছিল আত্মঅবমাননার নির্মম পরিহাস। নিস্তন্ধতা কখন কেটেছিল ক্লাস শেষের ঘন্টায় তার হিসেব ছিল না। ‘নিস্তন্ধতা হিরন্ময়’ – এই প্রবাদ মিথ্যে প্রমাণিত হয়েছিল। পন্ডিতমশাই- এর এই প্রশ্নের মধ্যেই লুকিয়ে ছিল ঔপনিবেশিক আমলে টোল চতুষ্পাঠীর শিক্ষক শ্রেণীর সমবেত কণ্ঠস্বর, অসহায়তার চালচিত্র।

পুনশ্চ

এই গল্পটি লেখকের প্যারিসের অভিজ্ঞতাপ্রসূত। প্যারিসের চেনা লোকজন গ্রীষ্মের অন্তিম নিশ্বাসের দিনগুলোয় ছুটি কাটাতে গিয়েছেন। লেখকের একাকীত্ব কাটছে প্লাস দ্য লা মাদলেনের জনতরঙ্গে গা ভাসিয়ে দিয়ে। এমন সময় একজন বললেন- ‘ বাঁ সোয়ার মসিয়ো ল্য দক্‌তর’। লেখক প্রাথমিকভাবে এই যুবতীকে চিনতে না পারলেও পরে মনে করতে পারলেন প্যারিস আসবার ট্রেনে এঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। লেখক এটিকেট অনুযায়ী ক্ষমাপ্রার্থনা করলেন। মাদমোয়াজেল কথককে জিজ্ঞেস করলেন- ‘মা- হারা শিশুর মতো ঘুরে বেড়াচ্ছেন যে?’ উত্তরে ‘ললাটঙ্ক লিখন’ শুনেই প্রস্তাব দিলেন সিনেমায় যাবার। কথকের ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি অবস্থা কিন্তু কিছুতেই এড়াতে পারলেন না যখন মাদমোয়াজেল বললেন তাঁর কাছে সিনেমার দুটি টিকিট আছে। সিনেমার ঘন্টাখানেক দেরি থাকায় তাঁর কাফেতে গেলেন। বিল মেটাতে হল কথককেই। সময় তখনও কিছু বাকি থাকতে অনিচ্ছাসত্ত্বেও যেতে হল রেস্টোরায়ে। এক কোর্স খাবার কথা বলে ক্লের এককথায় সাড়ে বত্রিশ ভাজা খেলেন। তারপর ওয়েটার এসে বলল এক চালান তাজা শুক্তি এসে পৌঁছেছে। ব্যস, ক্লের সেটাও অর্ডার করলেন। কথক রসিকতার সুরে বললেন- ‘ক্লের ঢেকুর তোলেননি। না জানি কত যুগ তপস্যা করার ফলে ফরাসী জাতি এক ডজন শুক্তি বিনা

ঢেকুরে খেতে শিখেছে। ফরাসী সভ্যতাকে বারংবার নমস্কার।’ সেই সঙ্গেই তিনি জানিয়েছেন- ‘প্রায় শেষ কপর্দক দিয়ে বিল শোধ করলুম।’ সে রাতে সিনেমায় গিয়েছিলেন তাঁরা, পাঁচ সিকের সিকের সিটে বসে বন্দুক- কামানের শব্দের মধ্যেও ক্লের ঘুমের শব্দ করছিল, ‘নাক ডাকা’ বলতে চাননি কথক কেননা সেটা গ্রাম্য শোনায়। এরপরও ক্লের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলেন, তাঁকে নিরস্ত করে লেখক বাসে করে হোটেলে ফিরছেন। বিধি বাম। বাসের টায়ার ফেটে যাওয়ায় আধ মাইল পথ হাঁটতে হবে। এমন সময় লেখক আরেক রমণীর সাহচর্যে এলেন তাঁকে নিয়েই কাহিনীর দ্বিতীয় ভাগ।

প্যারিসে রাতে নারীবর্জিতাবস্থায় চললে কানে আসবে- ‘বঁ সোয়ার মসিয়ো- আপনার সন্ধ্যা শুভ হোক’। উত্তর দিলেই মুশকিল। কিন্তু আনমনা লেখক সেই ভুলটিই করলেন। ক্ষমা চেয়ে বললেন- ‘অপরাধ নেবেন না, কিন্তু আপনাকে ঠিক প্লেস করতে পারছিলাম।’ এদিকে মেয়েটি কথকের সঙ্গে হাঁটতে শুরু করেছে। হঠাৎ হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। মেয়েটি তাঁর ক্লান্তির কথা বললে লেখক জানালেন তাঁর কাছে তিনটি কফি, একটা স্যানডুইচ আর পাঁচটি সিগারেটের পয়সা আছে। কাফেতে কড়া আলোতে মেয়েটির চেহারা দেখে কথকের মনে হল মেয়েটি না খেতে পেয়েই দুর্বল হয়েছে। কথায় কথায় মেয়েটি জানালো সেই রাতে তাকে খদ্দের যোগাড় করতেই হবে। মেয়েটির দুঃখ বেদনার কথা কথকের মন ছুঁয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু বৃথা সময় গেলে মুশকিল। মেয়েটিকে বিদায় দিয়ে কথক অপলক দৃষ্টিতে মেয়েটিকে দেখছিলেন- ‘তার সমস্ত দেহটি আপন অসীম সৌন্দর্য বহন করে চলেছে রাজধানীর মতো সোজা হয়ে, আর মাথাটি ঝুঁকে পড়েছে বেদনা আর ক্লান্তির ভারে।’

পরদিন সকাল হতেই লেখকের অনুশোচনা বোধ জাগ্রত হল। মেয়েটির নামটি যে জিজ্ঞেস করা হয়নি! সন্ধান করতে যাবার মুহূর্তে হাতে এল একটি ছোট পুলিন্দা, চিঠির মধ্যে মেয়েটি গ্রামে যাবার কথা বলেছে। আর সেদিন কফি খাবার প্রতিদান স্বরূপ পাঠিয়েছে সুয়েটার। পুনশ্চ শব্দটি চিঠির শেষে লেখা হয়। কাহিনীর শেষে মেয়েটির চিঠি রচনাটিকে মানবিক মর্যাদা দান করেছে। আখ্যানের দুটি অংশে দুজন নারী চরিত্র আসলে বহুমাত্রিক বাস্তবতার স্বার্থেই। প্যারিসের ভোগবিলাসপূর্ণ জীবনের অন্তরালে মেয়েটির দুর্দশা আমাদের অনুভবকে স্পর্শ করে বইকি।

বেঁচে থাকো সর্দি - কাশি

সৈয়দ মুজতবা আলীর কলমের জোর এই লেখা থেকে পাঠক নতুন করে অনুমান করতে পারবেন। কথকের ভয়ংকর সর্দি হয়েছে। স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে কথক জানাচ্ছেন, যা জল বেরোচ্ছে তা সামলানো রুমালের সাধ্য নয় ফলে ডবল সাইজের বিছানার চাদর নিয়ে বসতে হয়েছে। শীতের দেশ জার্মানি, দরজা জানলাও বন্ধ। হঠাৎ কথকের মনে হল মিউনিক শহরের এক ডাকসাইটে ডাক্তারের কথা, অপেরাতে গিয়ে যার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তাঁর বাড়িতে গিয়ে বললেন- “ সর্দির ওষুধ আছে? আপনার প্রথম এবং খুব সম্ভব শেষ ভারতীয় রোগীর একটা ব্যবস্থা করে দিন। আমার এক নাক দিয়ে বেরুচ্ছে রাইন, অন্য নাক দিয়ে ওড়ার।” জার্মান ডাক্তার সর্দির হাজার রকমের ওষুধ আছে জানিয়ে নিয়ে গেলেন বিশাল এক আলমারির কাছে। কথককে ওষুধ বেছে নিতে বললেন। এখানেই শেষ নয়। বললেন- “ যে ব্যামোর দেখবেন সাতাল্ল রকমের ওষুধ, বুঝে নেবেন সে ব্যামো ওষুধে সারে না।” কথক হেঁচেই যাচ্ছেন। ডাক্তার মিটমিট করে হেসে বললেন- “ সর্দি-কাশির গুণও আছে।” সেই সূত্রেই গল্পের মধ্যে গল্প করতে লাগলেন ডাক্তার।

বার্লিনে ডাক্তারি শিখে বছর তিনেক প্র্যাকটিস করার পর স্টেশনে গিয়েছেন বন্ধুকে বিদায় দিতে, ফেরার পথে স্টেশন রেস্টোরাই তুকে ডাক্তার থমকে গেলেন এক অপরিচিত সুন্দরীকে দেখে। ডানযুব নদীর প্রশান্তি যেন মুখে। লজ্জার ভাবের ওপর জোর দিয়েছেন এই গল্পের কথক ডাক্তার। প্রথম দর্শনে প্রেমে পড়েই তিনি ভাবছেন কোন অছিলায় কথা বলবেন। কিছুতেই মধ্যস্থানের তিনখানা টেবিলের দূরত্বকে পেরিয়ে যেতে পারছেন না- “ প্রবাদ আছে, প্রেমে পড়লে বোকা নাকি বুদ্ধিমান হয়ে যায়—প্রিয়াকে পাওয়ার জন্য তখন তাঁর ফন্দি- ফিকির আর আবিষ্কার কৌশল দেখে পাঁচজনের তাক লেগে যায়, আর বুদ্ধিমান নাকি প্রেমে পড়লে হয়ে যায় একদম গবেট—” মেয়েটি উঠে দাঁড়াতেই ডাক্তার পিছু নিলেন। মিউনিকের ট্রেনে খানা-কামরায় উঠলেন। ওয়েটাররা হয়ত ভাবল স্বামী- স্ত্রী , নাহলে মুখ গোমড়া করে এই কামরায় তরুণ- তরুণী ঢুকবেই বা কেন? ডাক্তার নিজেকে বুদ্ধিমান ভাবলেও কোনোভাবেই আলাপ জমাতে পারছেন না। এমন সময় জানলা দিয়ে কয়লার গুঁড়ো টেবিলে পড়ায় দ্রুত জানলা বন্ধ করতে গিয়ে নিজের আঙুল খেতলে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ফিনকি দিয়ে রক্ত। ঈশ্বর মুখ তুলে চাইলেন কেননা মেয়েটি তড়াক করে উঠে ব্যান্ডেজ নিয়ে আসার কথা জানাল। ক্ষতের সূত্রে স্পর্শ পেলেন ডাক্তার। সর্বাঙ্গে বিদ্যুৎ খেলে গেল। ধীরে ধীরে জমে উঠল আলাপ। ডাক্তার যখন লেখককে এই গল্প করছিলেন তখন অ্যাসিস্ট্যান্ট এসে জানাল রোগী এসে গেছে। ডাক্তার এক্ষুনি

আসছি বলে গল্পটি কমিয়ে শেষ করতে চাইছিলেন। লেখক বললেন তাল দ্রুত করে দিতে। আবার শুরু হল সেই মেয়েটির কথা। দুঃখিনী মেয়ে। বাবা- মা নেই। পিসির বাড়িতে মানুষ। কলেজের ফি যোগাড় করে মাস্টারি করে। যাইহোক মেডিক্যাল কলেজের রেস্টোরাই দেখা হতে লাগল তাঁদের। সুন্দরী এভাকে ছেড়ে তিনি বার্লিন চলে এলেন। চিঠি লিখলেন। এভা জানাল পিসি যতদিন আছেন নিভুতেই দেখা হবে। অভিসারের দিন হিসেবে কোনো বুধবার ডাক্তার মিউনিকে পৌঁছুলেন। এদিকে পাবলিক বুথে স্নান করে বাইরে বেরিয়েই ঠাণ্ডা লেগে গেছে। এভার বাড়ির সামনের রাস্তায় যখন দাঁড়ালেন টেম্পারেচার তখন শূন্যেরও নীচে। রাস্তায় এক ফুট বরফ। তিন মিনিট যেতে না যেতেই সর্দি শুরু হল। আর ডিনামাইট ফাটার শব্দের মতন হাঁচি। ডাক্তার কী করবেন ভেবে পাচ্ছেন না, এমন সময় এভা নিঃশব্দে এসে হাত ধরল। নিজের কামরায় নিয়ে গিয়ে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল। এমন সময় ডাক্তারের শুরু হল বিকট হাঁচি। পাশের ঘরে পিসি শুনলেই বিপদ। ডাক্তারের মাথার ওপর বালিশ কম্বল চাপিয়েও হাঁচির শব্দ আটকানো গেল না। দরজায় পিসির ধাক্কা। এভা ভয়ে নেতিয়ে পড়ে আছে বিছানায়। দরজা খুলে ডাক্তার শুনতে পেলেন পিসির তান্ডব বকুনি। থাকতে না পেরে ডাক্তার নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন “ আপনার ভাইঝিকে বিয়ে করতে চাই”। জানালেন এতদিন বিয়ে করার প্রস্তাব দিতে পারেননি যদি ‘না’ বলে বসে। পিসি প্রাথমিকভাবে দু’মিনিট নিয়েছিলেন ব্যাপারটা বুঝতে, তারপর জড়িয়ে ধরে চিৎকার করলেন। ইভা তখনো অচৈতন্য। বুড়ি বুড়োকে নিয়ে এলেন। দুপুর রাতে উৎসব শুরু হল। এভা কানে কানে ডাক্তারকে বলল- “ জীবনে এই প্রথম শ্যাম্পেন খাচ্ছি। তুমি আমার উপর একটু নজর রেখো।”

ডাক্তার উৎসাহিত হয়ে লেখককে গল্প শোনানোর মধ্যে দরজা খুলে ঢুকলেন এক সুন্দরী। লেখক বুঝতে পারলেন ইনি সেই মেয়ে। লাজুক হাসি হেসে হাত বাড়ালেন সুন্দরী। ডাক্তারের মুখে শোনা সব বিশেষণগুলো সত্যি বলে প্রতিভাত হচ্ছিল লেখকের। ফরাসি কায়দায় ‘চম্পক করাঙ্গুলি প্রান্তে ওষ্ঠ স্পর্শ করে’ মনে মনে বললেন- “ বেঁচে থাকো সর্দি- কাশি/ চিরজীবী হয়ে তুমি।” ডাক্তার দেখাতে এসে রোগের সূত্রে এক অনবদ্য মিলনান্তক প্রেমকাহিনি পেলাম আমরা। আর ‘চাচা কাহিনী’ বইটির সমাপ্তি হল মধুর রসের মধ্য দিয়ে।

.....

BENGALI (CBCS)/ SEM- 6 / DSE-1B : প্রবন্ধ ও ভ্রমণকাহিনি/ চাচা কাহিনী

Debayan Chaudhuri, Assistant Professor, Dept. of Bengali

Shahid Matangini Hazra Govt. College for Women, Purba Medinipur